গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৩ জুন ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বাসভাড়া

আন্দোলনের চাপেই বাকিটা কমাতে হবে

২০০৩-এর ১৫ এপ্রিল থেকে ৩১ মে'র মধ্যে চারবারে ডিজেলের দাম কমতে কমতে লিটারে ২৩.৫১ টাকা থেকে নেমে ২০.৪৭ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ লিটার পিছু ডিজেলের দাম কমেছে ৩.০৪ টাকা। ২০০৩-এর ১ এপ্রিল রাজ্য সরকার ডিজেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে বাস-ট্রামের ভাড়া স্টেজ প্রতি ৫০ পয়সা থেকে ১ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছিল। তখন ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছিল ২৩.৫১ টাকা। তেলের দাম লিটারে ৩.০৪ টাকা কমে যাওয়ায় যাত্রীসাধারণ ও এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে বারবার ভাড়া কমানোর দাবি জানানো হয়। ভাড়া বাড়ানোর সময় সি পি এম নেতা পরিবহনমন্ত্রী বলেই থাকেন তেলের দাম কমলে ভাড়া কমানো হবে। কিন্তু অতীতে তেলের দাম কমলেও ভাড়া কমানোর ক্ষেত্রে তাঁদের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ২০০১ সালের নভেম্বরে ডিজেলের দাম ১৭.১০ টাকা ছিল। তা থেকে কমতে কমতে ২০০২ সালের মার্চ মাসে ১৬.৫২ টাকা হয়। তখন আমাদের দলের রাজ্য সম্পাদক পরিবহনমন্ত্রীকে বাসভাড়া কমানোর দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠান। পরিবহনমন্ত্রী বলেন তেলের দাম কমেছে, ভাড়া কমানোর কথা বিবেচনা করা হবে। কিন্তু পরিবহনমন্ত্রীর এই 'বিবেচনা' আর ফলদায়ী হয়নি। মার্চ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত তেলের দাম কমে ১৬.৫২ টাকায় স্থিতিশীল থাকলেও পরিবহনমন্ত্রী ভাড়া কমাননি। এবার তেলের দাম অনেকটা কমে যাওয়ায় যাত্রী সাধারণের পক্ষ থেকে এবং এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে ভাড়া কমানোর প্রবল দাবি ওঠে। চাপে পড়ে পরিবহন মন্ত্রী পুরানো কায়দায় ভাড়া কমানোর কথা বলেই নীরব হয়ে যান। এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে ভাড়া কমানোর দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার পরে পরিবহন মন্ত্রী তাঁর পুরনো নাটক আবার শুরু করেন। বলেন বাসমালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে ভাড়া কমানো হবে। বাসমালিকরা হুমকি দেয়, ভাড়া কমালে তারা আন্দোলনে নামবে, বাস বন্ধ করে দেবে। এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের চাপা ক্ষোভ ফেটে পড়বে এবং এই নাটক করে এবার জনবিক্ষোভকে চাপা দেওয়া যাবে না — পরিবহনমন্ত্রী তা বুঝতে পারেন। তাছাড়া গণবিক্ষোভের প্রভাবে দলের মধ্যে ও ফ্রন্ট শরিকদের মধ্য থেকেও ভাড়া কমানোর চাপ আসে। তখন পরিবহনমন্ত্রী আর এক নাটক শুরু করেন। ঘোষণা করে দেন প্রতি স্টেজে ২৫ পয়সা ভাড়া কমানো হবে, বাস মালিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর তা চালু করা হবে। এর মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা মতো বাস মালিকরা ভাড়া কমানোর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারকে নানা হুমকি দিতে থাকে। পরিবহন মন্ত্রী এরই মধ্যে আর এক চাতুরীর পথ নেন। তিনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

টেলি-পরিষেবা

জনগণের ঘাড় ভেঙে এম পি-দের জন্য ঢালাও সুযোগ

জনগণের সঙ্গে জনপ্রতিনিধির ফারাক কতটা? অন্তত এদেশের টেলিফোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বি এস এন এল-এর কাজকারবার থেকে মনে হয়, এই ব্যবধান দুস্তর। কেন, সে কথায় পরে আসা যাবে। প্রথমত যেটা বলা দরকার, তা হল টেলিফোন আজ আর বিলাসসামগ্রী নয়। বিপদে-আপদে দুঃখে-আনন্দে দ্রুত যোগাযোগের এই মাধ্যম আজ শুধু শহুরে জীবনেই নয়, গ্রামের মানুষের কাছেও নিত্যব্যবহার্য হয়ে উঠেছে। ঠিকই, বাড়িতে টেলিফোন রাখার সামর্থ্য বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। কিন্তু শহরে নিতান্ত অপারগ না হলে মধ্যবিত্ত, এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষও চেষ্টা করে টেলিফোন রাখার। বিশেষ করে, পরিবহনের খরচ যত বাড়ছে, বহুক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় হিসাবে টেলিফোনের ব্যবহারও তত বাড়ছে। আর জনপ্রতিনিধিদের ত' টেলিফোন ছাড়া চলবে কি করে?

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সমস্ত জরুরি পরিষেবার মত টেলিফোনের উপরও সরকার তথা ব্যবসায়ীদের নেকনজর যেভাবে বাড়ছে, তাতে অনেক টেলিফোন গ্রাহককেই আজ ভাবতে হচ্ছে, এভাবে আর কতদিন টানা যাবে?

আটের পাতায় দেখুন

৫ জুন আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরে বেখটেল করপোরেশনের আন্তর্জাতিক দপ্তরের সামনে থেকে অবরোধকারীদের একজনকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। ইরাক পুনর্গঠনের নামে বেখটেল কোম্পানিকে ৬৮০ মিলিয়ন ডলারের বরাত দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদকারীদের দাবি — বরাত বাতিল করে ঐ টাকা ইরাকি জনগণকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন ৩০ জন অবরোধকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

(টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ৭.৬.০৩)

৬০ বছরের ইতিহাসে বৃহত্তম ধর্মঘট অস্ট্রিয়ায়

নতুন পেনশন বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হবার পরই অস্ট্রিয়া জুড়ে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এই নতুন পেনশন বিলে আগেকার সুযোগ সুবিধা ৩০ শতাংশ ছাঁটাই হচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে ডাক ও তার কর্মচারী, পরিবহন কর্মী, স্বায়ত্তশাসনের কর্মচারীরাও ৪ জুনের ধর্মঘটে নামে। বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে এটাই হল অস্ট্রিয়ার বৃহত্তম সাধারণ ধর্মঘট। সাফাই কর্মচারীরা এই ধর্মঘটে অংশ নেবার ফলে স্কুল-কলেজের সঙ্গে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলিও ৪ জুন বন্ধ ছিল।

ইটালি ও জার্মানিতেও ধর্মঘট

ব্যাপক ছাঁটাইয়ের বিরোধিতা করে ইটালির কেবিন কর্মীরা ৪ জুন ধর্মঘট করলে এয়ার আল ইটালিয়ার ২০০টিরও বেশি উড়ান বাতিল হয়।

বর্ধিত কাজের সময় কমানোর দাবিতে জার্মানিতে ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকরা ৪ জুন ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। (সংবাদসূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ৫ জুন, ২০০৩)

জেনিভা ও আঁভিয়ো

লেক জেনিভার এক পারে সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর, অপর পারে সুইস সীমান্তের লাগোয়া ফ্রান্সের আঁভিয়ো শহর। এই আঁভিয়ো শহরেই ১ জুন থেকে অনুষ্ঠিত হয় সাম্রাজ্যবাদী জি-৮ গোষ্ঠীর তিনদিনব্যাপী শিখর সম্মেলন। জি-৮-এর সদস্য ৮টি রাষ্ট্র — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, জাপান, কানাডা ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ভারত সহ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানেরাও আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল জেনিভা হ্রদের ধারে খাড়া পাহাড়ের মাথায় একটি বিলাসবহুল হোটেল।

এই সম্মেলনে উপস্থিত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হবে একথা জানাই ছিল। ব্রিটেন, ইটালি, জার্মানি, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, গ্রীস, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি ইউরোপের দেশগুলি থেকে লক্ষাধিক বিশ্বায়নবিরোধী বিক্ষোভকারী ৩০ মে'র আগেই জেনিভায় পৌঁছে গিয়েছিল।

৩০ মে জেনিভা থেকে ৪০ কি.মি. দূরে লুসানা শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও তুষার ঝড়ের মধ্যে সমবেত প্রায় ১০ হাজার মানুষের কণ্ঠে ছিল স্লোগান — 'অন্যরকম দুনিয়া সম্ভব।'

১ জুন জেনিভা ও আঁভিয়োয় এই

পাঁচের পাতায় দেখুন

গুজরাটে ভূকম্পপীড়িত মানুষ কেমন আছেন !

এস ইউ সি আই-এর সমীক্ষা

২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি গুজরাটে ভয়াবহ প্রাণঘাতী ভূমিকম্পে কয়েক হাজার মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। ভুজ, ভাচাও, আঞ্জার ও রাপর শহর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। দু'বছরে এই শহরগুলির পুনর্গঠন, উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়ন কতদূর কি হয়েছে, সে বিষয়ে এস ইউ সি আই গুজরাট ইউনিটের উদ্যোগে ৮ সদস্যের এক সমীক্ষক দল (সার্ভে টিম) ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ ২০০৩ এই চারটি শহরে সার্ভে করে 'ভূমিকম্পের ৮০০ দিন পর' নামক একটি রিপোর্ট ৫ মে বরোদাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করে। এই সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করে এস ইউ সি আই গুজরাট রাজ্য অর্গানাইজিং কমিটির সম্পাদক কমরেড দ্বারিকানাথ রথ বলেন — যেখানে প্রয়োজন ছিল দ্রুত সামগ্রিক উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পুনর্বাসনের কর্মসূচি গ্রহণ করা, রাজ্য সরকারের এক জানালা নীতি গ্রহণ করা যাতে ভূমিকম্পপীড়িতদের সুযোগ ও সাহায্য পেতে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে ঘুরে হেনস্থা ও হয়রান হতে না হয়, সেখানে মানুষজন এখনও অস্থায়ী আশ্রয়ে খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ভুজের স্থায়ী গৃহনির্মাণের জন্য ৫৪০০টি আবেদন পত্রের মধ্যে মাত্র ৩৪০০টি প্লট নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত দুই থেকে তিনবার শহর পরিকল্পনা সংশোধন করা হলেও সরকার পরিকল্পনা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তিনি অভিযোগ করেন, ক্ষতিপূরণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি এখনও দেওয়া হয়নি। পুনর্বাসনের পরিকল্পনায় ৭০ হাজার টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়েছে, যা নতুন বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে খুবই সামান্য। এই রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে অনুপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকায় ভূকম্পপীড়িত নাগরিকদের মধ্যে নানা ধরনের ক্রনিক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

যদিও সরকার বলছে টাকার অভাবে তারা নাকি পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করতে পারছে না, অথচ ভূমিকম্পবিধ্বস্ত কচ্ছে পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ৬০০০ কোটি টাকার অর্ধেকেরও কম, মাত্র ২২৮০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। প্রবল গতিতে পুনর্বাসনের কাজ চলছে বলে সরকার দাবি করলেও, বাস্তবে গত বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর এই পুনর্গঠনের কাজ অনেক পেছনে চলে গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে যেসব প্রকল্পের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি আজও সম্পন্ন হয়নি। এস ইউ সি আই বদোদরা ইউনিট ইনচার্জ কমরেড তপন দাশগুপ্ত একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ফাণ্ড থেকে ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ১৩৪টি স্কুল বাড়ি নির্মাণের জন্য। এ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি স্কুলবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। এস ইউ সি আই-এর আর এক স্বেচ্ছাসেবক কমরেড রনিতা নাগর অভিযোগ করেন — ভূমিকম্প হওয়ার চার মাসের মধ্যে আর আর লালন আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স কলেজ নির্মাণের জন্য ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অথচ আজও ঐ প্রজেক্টের কিছুই কাজ হয়নি।

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের প্রতি রাজ্য সরকারের চরম অবহেলাকে আড়াল করার জন্য গুজরাট স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, সমীক্ষার নাম করে যে সাজানো রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তারও তীব্র সমালোচনা করে কমরেড দ্বারিকা রথ বলেন, বাস্তবে যখন মাত্র ৬ শতাংশ বাড়ি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৯৪ শতাংশের ক্ষেত্রেই সামান্য মেরামত ছাড়া কিছুই করা হয়নি, সেখানে ঐ সংস্থা বলেছে ৮৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িরই নাকি মেরামত ও পুনর্গঠন করা হয়ে গেছে।

ভূমিকম্পবিধ্বস্ত জনগণের আর্থিক পুনর্বাসনের দিকেও রাজ্য বিজেপি সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। কচ্ছে শিল্প কারখানা গড়লে কর ছাড় দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করে সরকার বলেছিল এতে নাকি ৪০০টি শিল্পসংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। এখন সরকার বলছে ৫৮টি শিল্পকে নাকি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এস ইউ সি আই সমীক্ষক দলের বক্তব্য মাত্র ১১টি সংস্থা সেখানে কাজ শুরু করেছে। ফলে, বেকারির সমস্যাও তীব্র রূপ নিয়েছে।

কমরেড রথ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন — ভূমিকম্পের দুই বছর পরও বিধ্বস্ত স্কুল বাড়িগুলিরও পুনর্গঠন করা হয়নি। বহু স্থানে সমীক্ষক দল দেখেছেন, ছাত্ররা আজও খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে।

পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ও উন্নয়নের প্রবল প্রচারের আড়ালে ভূকম্প পীড়িত গুজরাটবাসীর প্রতি বিজেপি সরকারের হৃদয়হীন আচরণেরই প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে এই সমীক্ষা রিপোর্টে।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতীদের সংবর্ধনা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান গত ১ জুন নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এ বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে হুগলী জেলার ছাত্রী সুচন্দা বসু। ৪০০-র মধ্যে সে পেয়েছে ৩৯০। এবার পরীক্ষায় পাশের হার ৬৫.১৩ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৫.৪৫ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮.৪৪ শতাংশ এবং সাধারণভাবে ১২.০৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। বিষয় ভিত্তিক পাশের হার — ইংরাজী বিষয়ে ৮৮.৩৬ শতাংশ, বিজ্ঞানে ৮৭.৪০ শতাংশ, ইতিহাস-ভূগোলে ৭৯.৩৭, গণিতে ৭৯.০৫ শতাংশ ও মাতৃভাষায় ৭৭.৭৬ শতাংশ। প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।

প্রায় ৫০০ জন কৃতী-ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এর মধ্যে রাজ্যস্তরে বৃত্তিপ্রাপক ৫৫ জন। তাদের প্রত্যেককে এক বছরের জন্য ১২০০ টাকা প্রদান করা হয়। জেলা বৃত্তিপ্রাপক ৪৫০ জনকে এক বছরের জন্য ৬০০ টাকা দেওয়া হয়। বৃত্তির মোট অর্থমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা। বিশেষ শংসাপত্রও এদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পর্ষদ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা বলেন, এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে রাজ্য সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি মানুষ গ্রহণ করেনি। তিনি অবিলম্বে সরকারের কাছে প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল ও বৃত্তি পরীক্ষা এবং প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরাজী চালু করার দাবি জানান।

নজরুল মঞ্চে র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সভাপতির ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষার মানের উন্নয়নকল্পে এই পরীক্ষা এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকার দাবি না মানলে আমাদের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল বলেন, গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্বত্র এই পরীক্ষা যেভাবে সাড়া জাগিয়েছে, তাতে সরকারের উচিত অবিলম্বে সমস্ত দাবি মেনে শিক্ষায় সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

মানিক মুখার্জী বলেন, এই পরীক্ষা আজ সর্বসাধারণের পরীক্ষায় পর্যবসিত হয়েছে। সরকার দাবি না মানলে সর্বস্তরের মানুষকে আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অবরোধ করে রাস্তা সারানোর দাবি আদায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সিংহ-দুয়ার মেছাদা স্টেশন। অথচ ৪১নং জাতীয় সড়ক থেকে মেছাদা বাস স্ট্যাণ্ডে আসার বাস রাস্তাটি ভেঙেচুরে বাস চলাচলের অযোগ্য হলেও রাজ্য পি ডবলু ডি দপ্তর বা কোলাঘাট থার্মালপ্লান্ট কেউ এই রাস্তাটি সংস্কারের দায়িত্ব নিতে নারাজ। উভয় দপ্তরই জানায় ঐ রাস্তাটি তাদের দপ্তরের নয়। এই অবস্থায় দুই-আড়াই বছর ধরে এই অচল রাস্তায় কোনরকমে বাস চলাচল করছে। ৩ জুন এস ইউ সি আই মেছাদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে বেলা ৪টা থেকে ঐ রাস্তায় অবরোধ করা হয়। এক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর — পি ডবলু ডি ইঞ্জিনিয়ার এসে প্রতিশ্রুতি দেন, দু-তিন দিনের মধ্যে ঐ রাস্তাটি তারা সংস্কার করে দেবেন। ৪ জুন থেকে ঐ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে।

বাস ভাড়া কমানোর দাবিতে তমলুকে পথ অবরোধ

তেলের দাম ৩ টাকা কমায় মেদিনীপুর জেলায় বাসের ভাড়া কমানোর দাবিতে ৪ জুন তমলুক মানিকতলা মোড়ে বিকাল ৫টা থেকে ৫-৩০ পর্যন্ত পথ অবরোধ করা হয়। এস ইউ সি আই তমলুক লোকাল কমিটির নেতৃত্বে এই অবরোধে স্থানীয় মানুষ ও অবরুদ্ধ বাসের যাত্রীরা বাস থেকে নেমে এসে অংশ নেন।

নামখানা ব্লক উন্নয়ন কমিটির বিক্ষোভ

পানীয় জলের অভাব, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ভাঙাচোরা সড়কে প্রাণহাতে নিয়ে যাতায়াত, মাথার ওপর ছাদহীন নামখানার গরিব মানুষদের হয়ে কথা বলেছে তাদেরই নিজস্ব সংগঠন নামখানা ব্লক উন্নয়ন কমিটি।

শাসকদল ও বৃহৎ বিরোধী দল যেখানে নিশ্চুপ, সেখানে উন্নয়ন কমিটির আন্দোলনের পাশে রয়েছে এস ইউ সি আই।

২ জুন তাঁরা মিছিল করে বিডিও-র কাছে বাঁধ মেরামত, পানীয় জল, রেশন কার্ড, রাস্তা সারাই প্রভৃতির জন্য দাবি জানান। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং কিছু দাবি পূরণ করার আশ্বাস দেন।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও সুপ্রিমকোর্টের রায়

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অবস্থার একটি মারাত্মক উদ্বেগজনক দিক সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের পর্যন্ত খুবই বিচলিত করেছে। সেটি হচ্ছে, অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত লোক বলে চিহ্নিত, এমনকি অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার জন্য যাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে, শাসক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবং সরকার পরিচালনায় এমন লোকদের প্রভাব দ্রুত বাড়ছে। ১৯৯৭ সালে বিজয়ী সাংসদদের ৪০ জন এবং ৭০০ বিধায়কের ক্রিমিনাল রেকর্ড ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই সাজা পেয়েছে, অনেককে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আইনের রক্ষকরাই আইনের ভক্ষকে পরিণত হয়েছে। অবস্থা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, শাসনক্ষমতায় বা বিরোধী পক্ষে যেখানেই থাকুক, পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা মনোনীত হয়ে এরা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছে এবং অনেকেই নির্বাচিত হচ্ছে। এদের কেউ কেউ আবার মন্ত্রীও হয়ে যাচ্ছে। দেশের আইনপ্রণয়ন এবং শাসন পরিচালনার প্রক্রিয়ায় এইভাবে অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, এমনকি দাগী অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের সামনে চলে আসার মত ঘটনার সর্বনাশা পরিণাম দেশের সমস্ত স্তরের মানুষকে খুব স্বাভাবিক কারণেই চঞ্চল করে তুলেছে। রাজনীতির মঞ্চে অপরাধজগতের লোকজনের এই অবাধ অনুপ্রবেশ, যা ইতিমধ্যেই "রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন" বলে অভিহিত হচ্ছে — তার অবসানের জন্য সমস্ত স্তরের মানুষ অধীর হয়ে উঠেছেন।

সুপ্রিমকোর্টের রায়

সাংবিধানিক বা আইনি রাস্তায় এর প্রতিবিধানের উপায় আছে কি না, চিন্তাশীল জনসাধারণের একাংশ তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠনের পক্ষ থেকে জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় হিসাবে দিল্লী হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। দিল্লী হাইকোর্ট এই মামলার রায়ে, ভোটদাতা জনসাধারণের তথ্য জানার অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) ধারায় বাক-স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার যে মৌলিক অধিকার রয়েছে, তা থেকে উদ্ভূত একটি মৌলিক অধিকার বলেই অভিমত প্রকাশ করে। হাইকোর্ট তার রায়ে এই মৌলিক অধিকারের অনুসরণে, নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানের ৩২৪ ধারা অনুসারে নির্বাচন প্রার্থীদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের কোন রেকর্ড বা অপরাধের সাথে কোন যোগ আছে কিনা, একই সাথে তাদের পরিসম্পদ ও দায়-এর (assets and liabilities) পূর্ণ বিবরণ, অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় এফিডেভিট মারফৎ আইনগতভাবে ঘোষণা করা বাধ্যতামূলক করার জন্য নির্দেশ দেয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিল্লী হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট ২০০২ সালের ২ মে'র রায়ে আপিল খারিজ করে দিল্লী হাইকোর্টের পূর্বোক্ত রায়কেই বহাল রাখে। এরই ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন ২০০২ সালের ২৮ মে এক নির্দেশনামা জারি করে। এই নির্দেশ অনুসারে নির্বাচন প্রার্থীদের উপরোক্ত তথ্য সম্বলিত এফিডেভিট দাখিল করা বাধ্যতামূলক হয়। নির্বাচন প্রার্থীদের প্রদত্ত এফিডেভিট-এ কোন ভুল তথ্য আছে মনে করলে বা সঠিক তথ্য নেই বলে মনে করলে রিটার্নিং অফিসারকে সেইসব মনোনয়নপত্র বাতিল করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুসারে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রার্থীদের জন্য এই নির্দেশনামা জারি করায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। উদ্বেগের প্রথম বিষয় ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ভোটে দাঁড়ানোর মাপকাঠি করা। কারণ ডিগ্রির নিরিখে কম শিক্ষিত অথবা নিরক্ষর নাগরিকও বিধানসভায় বা সংসদে নির্বাচিত হয়ে কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন — এমন বহু নজির রয়েছে। ফলে প্রশ্ন হল, জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি লোক যেখানে দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার সুযোগ পায়নি, সেখানে স্কুল-কলেজের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে নির্বাচনে দাঁড়াবার মাপকাঠি করার কোন যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা। অন্যভাবে বললে, এর দ্বারা অল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর নাগরিকদের নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে নিরুৎসাহিত করা এবং এই পথে একটা পর্যায়ে গিয়ে তাদের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার পর্যন্ত হরণ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে কি না বা এটা তার পূর্ববর্তী পদক্ষেপ কিনা — সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হল, এফিডেভিটে প্রার্থীদের দেওয়া বিবরণ সঠিক বা যথেষ্ট না মনে করলে মনোনয়নপত্র খারিজের চূড়ান্ত ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারদের হাতে দেওয়া। স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্ত চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী।

তৃতীয় বিষয়টি ছিল প্রার্থীর অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকার বিবরণ সংক্রান্ত বিষয়। প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের প্রতিপক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত দলগুলির নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত মিথ্যা মামলা দায়ের করছে, মিথ্যা মামলায় তাদের জড়িয়ে দিচ্ছে এবং এইভাবে যাদের সঙ্গে অপরাধমূলক কার্যকলাপের কোন সম্পর্কই নেই তাদেরকেও অপরাধী সাজাচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনামায় এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ খুঁজে বের করা এবং সেগুলি দেখার আলাদা করে প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা নেই। এই পটভূমিতে বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলি পার্লামেন্টের বিরোধী দলগুলির সাথে পরামর্শ করে সুপ্রিমকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশনামা বাতিলের উদ্দেশ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে (People's Representation Act) একটি সংশোধনী নিয়ে আসে এবং তাতে নতুন করে ৩৩খ ধারা যোগ করে।

এই ধারায় বলা হয়েছে — "কোন আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশে যাই বলা হোক না কেন; নির্বাচন কমিশন যা-ই আদেশ বা নির্দেশ দিক না কেন — বর্তমান আইন বা পরবর্তীকালে তৈরি বিধি অনুযায়ী যেসব তথ্য পেশ করা প্রার্থীর পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেইসব তথ্য পেশ বা পরিবেশন করতে প্রার্থী বাধ্য থাকবেন না।" এই সংশোধনী অনুযায়ী যাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজের জন্য দুবার চার্জশিট আনা হয়েছে — এক-মাত্র তাদের ক্ষেত্রেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার বাতিল করা হয়।

এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য যে ইলেকশন কমিশনের নোটি-ফিকেশনকে অকার্যকরী করে দেওয়া তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। সংশোধনী চালু হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনটি বেসরকারি সংস্থা — পি ইউ সি এল, লোকসত্তা এবং অ্যাসোসিয়েসন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম — সুপ্রিমকোর্টে এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে। ২৩ মার্চ ২০০৩, সুপ্রিমকোর্ট ৩৩(খ) সংশোধনীকে সংবিধান ও আইনবিরুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর দ্বারা সর্বোচ্চ আদালত ২ মে ২০০২ তারিখে দেওয়া পুরনো সিদ্ধান্তই বজায় রাখে, পার্থক্য শুধু এটুকুই যে, এবারের রায়ে সুপ্রিমকোর্ট বলে, কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের থাকবে না, যা আগের রায়ে রিটার্নিং অফিসারদের দেওয়া হয়েছিল। ২ মে তারিখে দেওয়া রুলিংকে অকার্যকরী করে দেওয়ার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিমকোর্ট বলে — "সুপ্রিমকোর্টের ঘোষিত আইন বাধ্যতামূলক নয় — এমন ফতোয়া আইনসভা দিতে পারে না।" সুপ্রিমকোর্ট আরও বলে — "সাংবিধানিক কারণেই" সর্বোচ্চ আদালতকে "এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, না হলে আইন পাশ হওয়ার পরেও আইনী বাধ্যবাধকতা বলে কিছু থাকে না।"

রায়ের দুটি গুরুতর দিক

সুপ্রিমকোর্টের ১৩ মার্চের ওই রায়ের দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথম দিকটি হচ্ছে — রাজনীতিতে দাগী অপরাধীদের দ্রুত অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে এদের অনেকেই নির্বাচিত হচ্ছে, এটা ঠিক; কিন্তু এদের দিয়ে এভাবে এফিডেভিট করিয়ে নিলেই কি তা প্রতিহত করা যাবে?

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে, আইনসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত আইন বাতিল করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্টের হাতে থাকা উচিত কি না। সংবিধান সুপ্রিমকোর্টকে আইনপ্রণয়নের অধিকার দেয়নি। আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের বিষয়টিকেই বিচারবিভাগের ভূমিকা হিসাবে সংবিধানে ভাবা হয়েছে। এর বাইরে বিচারবিভাগের অন্য কোন আইনগত অধিকার নেই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট ও তার সঙ্গে আরও কিছু কিছু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সুপ্রিমকোর্টের আইন-প্রণয়নের অধিকার আছে বলে বলতে শুরু করেছেন। এমনকি সুপ্রিমকোর্টও সংবিধান রক্ষার নামে ১৩ মার্চের রায়ে এই ধরনের দাবি করেছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে এ জিনিস আদৌ সমর্থন যোগ্য কি না — এটা বড় প্রশ্ন।

দুর্বৃত্তায়ন আকস্মিক ঘটনা নয়

রাজনীতিতে, বিশেষ করে বলতে গেলে লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচনে, অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, দাগী অপরাধীদের প্রাদুর্ভাব নিঃসন্দেহে জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে; গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচারআচরণ যতটুকু আজও টিকে আছে তার ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারে রাজনীতির জগতে অপরাধীদের ক্রমবর্ধমান এই অনুপ্রবেশকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মুমূর্ষু পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে যে বুর্জোয়া রাজনীতি চালু রয়েছে সেটাই প্রতিমুহূর্তে এইসব অপরাধীর জন্ম দিচ্ছে, এদের কাজে লাগাচ্ছে। এদের কাজে লাগিয়েই বুর্জোয়া রাজনীতি আজ টিকে আছে।

আপামর জনসাধারণকে প্রতিদিন নিত্যনতুন উপায়ে শোষণ করে পুঁজিপতিরা এবং তাদের তাঁবেদার রাজনৈতিক দলগুলি দ্রুত জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নৈতিক সমর্থন আজ এরা আশা করতে পারে না। জনগণকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, জনগণের যতটুকু বাঁচার সুযোগ, যতটুকু অধিকার এখনও অবশিষ্ট আছে তাও এরা কেড়ে নিচ্ছে। জনগণকে লুটবার ও বঞ্চিত করবার জন্য তারা প্রতিদিন ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করছে। এই অবস্থায়, এইসব অপকর্ম করতে করতেই নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য এরা প্রতিদিন নানা ফন্দি আঁটছে। একই সঙ্গে অপরাধজগতের লোকদের সঙ্গে তারা নিবিড় আঁতাত গড়ে তুলছে এবং এইভাবে বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে অপরাধজগত একাকার হয়ে যাচ্ছে। এটা কোন আকস্মিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আজ অপরাধজগত ও অপরাধীরা অপরিহার্য এবং এই অর্থেই অপরাধ-জগত আজ এদের আশ্রয়স্থল। আবার অন্যদিক থেকে অপরাধজগতের সাথে যুক্ত কাপ্তেন-মস্তানদের কাছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির চেয়ে বড় আশ্রয়স্থল আর নেই।

ইতিপূর্বে বুর্জোয়া রাজনীতিকরা, টাকাপয়সার বিনিময়ে অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিত। জনগণকে ভয় দেখানো, জনগণের আন্দোলন-শ্রমিক আন্দোলন ভেঙে দেওয়া, ভোটের সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, ভয় দেখিয়ে ভোট আদায় করা, বুথ দখল করা, জবরদস্তি ভোটপত্রে ছাপ্পা মারা সহ নানা ধরনের জালিয়াতির কাজ এদের দিয়ে করাত। কিন্তু অধুনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অপরাধজগতের সাথে যুক্ত এই সমাজবিরোধীরাই এখন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও বুর্জোয়া সরকারের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে যাচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের রাজনীতিতেই আজ অর্থ এবং পেশীশক্তিই বুর্জোয়া শাসনকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন বুর্জোয়া রাজনীতি টিকে থাকবে, ততদিন রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন থেকে জনগণের রেহাই নেই। কারণ, বুর্জোয়া রাজনীতির স্বার্থেই দুর্বৃত্তদের টিকিয়ে রাখা হবে। বুর্জোয়া রাজনীতিই হচ্ছে অপরাধীদের উৎপত্তিস্থল। তাই অপরাধজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা এফিডেভিট-এর মাধ্যমে ঘোষণা করিয়ে নিয়ে চিহ্নিত দু/চারজন দাগী অপরাধীর ভোটে দাঁড়ানো অথবা ভোটে জেতা যদি আটকানো যায়ও, তাতেও মূল সমস্যার কোনও সুরাহা হবে না।

সকলেরই জানা আছে, শাসক বুর্জোয়া দলের আনুকূল্যে ও

চারের পাতায় দেখুন

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও সুপ্রিমকোর্টের রায়

তিনের পাতার পর

পৃষ্ঠপোষকতায় হাজার হাজার অপরাধী প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের অপরাধ নথিভুক্ত করা বা এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা তো হয়ই না, বরং এদের জঘন্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঢেকে রাখাই হচ্ছে আইনশৃঙ্খলার তথাকথিত রক্ষক পুলিশের কাজ। পুলিশের প্রতি সরকারি বুর্জোয়া দলগুলির এটাই হচ্ছে কঠোর নির্দেশ। শুধু শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়া দলগুলিই নয়, পুঁজিপতিশ্রেণীর আনুকূল্য পায় এমন পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী বিরোধী দলগুলির সঙ্গে জড়িত অপরাধজগতের লোকেরাও পুলিশের এই আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত নয়। এরাও একইভাবে সুরক্ষিত। এমনকি গুরুতর অপরাধ করলেও এদের কোন শাস্তি হয় না। ফলে, বুঝতে অসুবিধা নেই যে, প্রচলিত আইনি বিধি-বিধানের দ্বারা দু-চারটি চিহ্নিত দাগী অপরাধীর ভোটে দাঁড়ানো ও ভোটে জেতা ঠেকানো সম্ভব হলেও, এই বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যে আইনি পথে অপরাধজগতের লোকদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাবে না। চোরাই পথে তা চলতেই থাকবে। এক অপরাধী গেলে আর এক অপরাধী আসবে। আমাদের মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, পুঁজিপতিদের কালো টাকা এবং তাদের রক্ষক দুর্বৃত্তরাই এখন পুঁজিবাদী রাজনীতির প্রধান শক্তি। সুতরাং একথা পরিষ্কার যে, আমাদের মতো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই।

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হচ্ছে, অপরাধজগতের এইসব চাঁইরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এই কারণে নয় যে ভোটদাতা জনসাধারণ এদের চরিত্র, অপরাধজগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগের কোন খবর জানেন না। এদের সমস্ত অপরাধমূলক কাজকর্ম জনসাধারণের নজরে আছে। ভোটদাতা জনসাধারণ এদের নাড়ি-নক্ষত্র সবই জানেন। তবুও জনগণ এদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছেন না। কারণ, গোটা নির্বাচনপ্রক্রিয়া আজ এরাই নিয়ন্ত্রণ করে। এরা সরকার নিয়ন্ত্রণ করে, এরা পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, এরাই পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত দলগুলির ধারকবাহক। স্বাভাবিকভাবেই কেউ প্রশ্ন করতে পারেন — তাহলে কি এদের দৌরাত্ম্য ও রাজনীতিতে এদের অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই ? আমরা মনে করি, নিশ্চয়ই আছে।

পরিত্রাণের পথ

এদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে মুক্ত করতে হলে জনগণকে দুর্জয় গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র এই গণআন্দোলনের শক্তির জোরেই পেশীশক্তি ও টাকার জোরে বলীয়ান ও পুলিশ-প্রশাসন দ্বারা সুরক্ষিত অপরাধী ও সমাজবিরোধীদের সম্মুখ সমরে পরাস্ত করে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তিদের, গণআন্দোলনে পরীক্ষিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে দাঁড়ানো ও নির্বাচিত হওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে। লড়াইটা স্পষ্টতই জনগণ বনাম দুর্বৃত্তদের দখলাধীন বুর্জোয়া রাজনীতির লড়াই। ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অন্য পাঁচটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মত এই লড়াইও প্রকাশ্য রাস্তায় লড়তে হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী কোর্ট-কাছারিতে কিংবা বুর্জোয়া সংবিধান বা বিচারব্যবস্থার উপর নির্ভর করা চলবে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমাদের দেশের বিচারব্যবস্থা যেহেতু বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই একটা অঙ্গ, সেই কারণে তা নিরপেক্ষ হতে পারে না।

এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তির নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ঢোকার দ্বিতীয় প্রতিষেধক হচ্ছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার (রাইট টু রিকল) প্রবর্তন করা। শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলে জনগণ এই সাংবিধানিক অধিকার আদায় করতে পারলে — জনগণের পক্ষে এই অবস্থা মোকাবিলা করা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজতর হবে। বস্তুত, যদি এই অধিকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়, তাহলে চিহ্নিত কোন দাগী অপরাধী জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচিত হলেও, জনগণ ঐ অধিকারবলে তার নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারবেন।

সুপ্রিমকোর্টের রায়ের আর একটি উদ্বেগজনক দিক রয়েছে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, বরং সমাজের উচ্চস্তরের ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থা সুপ্রিম কোর্ট, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত আইনকে তাদের খেয়ালখুশি মতো নাকচ করে দেওয়ার এবং প্রয়োজনমত আইন প্রণয়নেরও অধিকার দাবি করছেন। সর্বশেষ এই রায়েও তারা স্পষ্টভাবে সেকথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের জুডিশিয়াল রিভিউ সিসটেম অনুসারেই তারা এই অধিকার দাবি করছেন। তাদের সমর্থকরা এই দাবির সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরোক্ত প্রথাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যেহেতু খুবই অনমনীয় এবং তাতে কোনও সংশোধন আনতে হলে যেহেতু খুব জটিল ও দুরূহ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেজন্যই বহু বছর আগে সেখানকার সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক প্রয়োজন পূরণের জন্য সংবিধান ব্যাখ্যার নাম করে এই কাজ করেছিল। কিন্তু আজ সেখানেও এর বিরুদ্ধে চিন্তাশীল জনমত গড়ে উঠছে। কারণ, মার্কিন সমাজের উচ্চস্তর থেকে আগত ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত বিচারকরা সেখানকার শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থে এই ধরনের জুডিশিয়াল রিভিউ করছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে, এখানে সংবিধান অনেক বেশি নমনীয় এবং সংবিধান সংশোধনও অপেক্ষাকৃত সহজ।

সুতরাং, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমেরিকার তথাকথিত জুডিশিয়াল রিভিউ সিস্টেমের নজির দেখিয়ে বিচারবিভাগের হাতে আইনপ্রণয়নের অধিকার দেওয়ার কোন ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি বা যৌক্তিকতা নেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সুপ্রিমকোর্টকে আইনপ্রণয়নের এই অধিকার দেওয়ার চিন্তা আসছে মুমূর্ষু দুর্নীতিপরায়ণ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে, বর্তমানে যে তীব্র সঙ্কটের সামনে তারা পড়েছে তার থেকে তাদের বাঁচাবার জন্যই। এই অধিকার বিচারবিভাগের হাতে ন্যস্ত হলে, তা নিশ্চিতরূপেই জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কুচিত ও হরণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তদের অনুপ্রবেশ বা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এর দ্বারা বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রিত হবে না।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, সুপ্রিমকোর্টের এই রায়কে এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করে দেখতে হবে এবং রাজনীতিতে অপরাধজগতের লোকদের অবাধ অনুপ্রবেশ ও বিচরণ বন্ধ করার জন্য দেশব্যাপী শক্তিশালী গণআন্দোলনের উপরই নির্ভর করতে হবে।

বিজেপি'র মূল্যবোধের খোলস ভেদ করে দুর্নীতির গন্ধ

বিজেপি'র মূল্যবোধের রাজনীতির ফানুসটা অনেক আগেই ফেঁসে গেছে। নানা কেলেঙ্কারির পাঁকে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা ডুবছে। যত দিন যাচ্ছে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের ঘুষ, দুর্নীতি সহ নানা কেলেঙ্কারির কদর্য চেহারা উগ্র হিন্দুত্বের খোলস ভেদ করে বেরিয়ে পড়ছে। অবক্ষয়িত, দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী আদর্শ, মূল্যবোধ ও রাজনীতির ধারক-বাহকরা যতই বাইরের ভদ্র পোষাক ও আতরের সুগন্ধের আড়ালে নিজেদের ঢেকে রাখার চেষ্টা করুক, পচা গলা পুঁতিগন্ধময় দূষিত বুর্জোয়া আদর্শের বাহক হিসাবে তার অনিবার্য পরিণতিতে বিজেপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক পচন এখন আর আড়াল করা যাচ্ছেনা। তহলকা ডট কম, ইউনিট ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের টাকা আত্মসাৎ সহ নানা দুর্নীতি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, যত দিন যাচ্ছে আরও নতুন নতুন দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে। সম্প্রতি গুজরাটের আনন্দ থেকে নির্বাচিত বিজেপি এম পি দীপক সাথীর বিরুদ্ধে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে। চারোতার নাগরিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অফিসারদের সঙ্গে মিলে দীপক ও তাঁর বাবা চিমনভাই ১৮০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে অভিযুক্ত। চিমনভাই ঐ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। গত বছর নভেম্বরে এই দুর্নীতির ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিত হয়। এই ঘটনায় চিমনভাই সহ ১৩ জনকে কয়েক মাস আগে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হলেও গুজরাটের বিজেপি নেতাদের মদতে দীপক গ্রেপ্তার এড়িয়ে 'আত্মগোপন' করে রয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা গেলেও পুলিশ নাকি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ঐ ব্যাঙ্কের বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাঁরা শোধ দেননি তাঁদের নামের তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন দীপক সাথী ও তাঁর বাবা। ৩৬.৫০ কোটি টাকা এঁরা নিয়েছেন। এর মধ্যে স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র 'নয়া পদকর'-এর ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে দীপক ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন পত্রিকার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার নাম করে। যদিও এব্যাপারে তিনি কিছুই করেননি, টাকাও শোধ করেননি।

গুজরাটের চারোতার নাগরিক কো-অপারেটিভের দুর্নীতি প্রথম ঘটনা নয়। গত দু'বছরে পরপর কয়েকটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বিজেপি নেতা, মন্ত্রী, এম পি-রা। এক্ষেত্রে মাধোপুরা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ১৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য। সুরাটের বিজেপি নেতা সি আর পাতিল, যিনি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুবই ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহযোগী, তিনি কয়েকমাস আগে ডায়মন্ড কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বিপুল টাকা তছরূপের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

শুধু গুজরাটে নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরাও টাকা চুরির দায়ে অভিযুক্ত। দুর্নীতির অভিযোগে বিজেপি'র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি এন রামচন্দ্রন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। রামচন্দ্রনের পি এ আর পেরুমলস্বামী এক রেভেনিউ সার্ভিস অফিসারকে মুম্বাইতে বদলির ব্যবস্থা করে দিয়ে ৪ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের আত্মীয়স্বজনরা বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের তাদের পছন্দের জায়গায় বা ভাল পোস্টে বদলি করে দিয়ে ঘুষ নিতেন। অধিকাংশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছে। এই বদলির জন্য পদ অনুযায়ী ২ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ দেওয়া হয়ে থাকে !

সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ঘুষ-দুর্নীতি সহ নানা কেলেঙ্কারিতে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরাই কেবল জড়িয়ে পড়েছে তাই নয়, অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে কংগ্রেসও দুর্নীতি করেছে। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতায় যে দল আছে তারাও দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি থেকে মুক্ত থাকতে পারছে না। পশ্চিমবাংলায় সি পি এম নেতৃত্বে ফ্রন্ট সরকারও এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত নয়। কত রকম দুর্নীতিতে এই রাজ্যের সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা যে যুক্ত তার তালিকা তৈরি করতে গেলে শেষ হবে না। কেরালায় সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালীন এক বেআইনি চোলাই মদ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছিল কয়েকজন নেতা। সি পি এম দল ঐ নেতাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি, বরং ঐ নেতাদের অভিযোগের হাত থেকে রক্ষা করতে যুক্তি করেছে, দলের প্রয়োজনে এ ধরনের টাকা নেওয়াটা অন্যায় নয় !

আসলে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-বিজেপি সহ অন্যান্য দল এমন কি তথাকথিত বামপন্থী নামধারী সিপিএম পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে পরিষদীয় রাজনীতিতে যেনতেন প্রকারে জয়লাভ, ক্ষমতা করায়ত্ত রাখা এবং ভোগলালসার অত্যুগ্র বাসনায় দুর্নীতির পাঁকে ক্রমশ ডুবছে। যতদিন যাবে এদের কদর্য রূপ আরও প্রকাশ পাবে।

তাহলে ক্ষমতায় বসলেই কি সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে ? না, তা হবে না। অবক্ষয়িত বুর্জোয়া মূল্যবোধ নয়, যথার্থ কমিউনিস্ট মূল্যবোধের ভিত্তিতে সত্যিকারের একটি কমিউনিস্ট পার্টি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পরিপূরক গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে যদি সরকারে যায়, সেই দল একদিকে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি দমনপীড়নের হাত থেকে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিকে যেমন রক্ষা করবে, সাথে সাথে সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে মালিকদের স্বার্থ নয়, শোষিত মানুষের স্বার্থে যতটুকু রিলিফ ওয়ার্ক করা যায় তা করে যাবে। এই পথেই কেবল দুর্নীতিমুক্ত সরকার পরিচালনা করা সম্ভব। অন্য কোনভাবে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকা আজকে আর কোন দলের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইরাক ঃ আগ্রাসনের পর শুরু হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম

বাগদাদে মার্কিন সেনাবাহিনীর হাইকমাণ্ডের দেওয়া এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে তাদের একটি টহলদার বাহিনীর উপর কে বা কারা অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েছে। মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ সচরাচর প্রতিরোধ লড়াই-এর ঘটনাগুলি চেপে রাখার চেষ্টা করে।

প্যারিসে প্রবাসী ইরাকিদের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের একজন প্রবীণ নেতা, যাঁকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সঙ্গে হাত মেলানোর প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তিনি বলেন, "প্রতিরোধ লড়াই এই তো সবে শুরু হয়েছে।"

'ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ ইরাক' (NLFI)-এর নেতা আবদেল আমীর আল রিকাবি জানিয়েছেন, "বাগদাদে মার্কিন দখলদারির পর থেকে ২০ জন মার্কিন সেনা নিহত এবং ১০টি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।" তিনি আরও জানিয়েছেন "সংবাদপত্রের উপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষকে ঘোষণা করতে হয়েছে যে, কয়েকদিনের মধ্যে ইরাকে তাদের নিহত সেনা সংখ্যা ১২৬ থেকে বেড়ে ১৫৮তে দাঁড়িয়েছে।" গত সপ্তাহে NLFI ইরাকি জনগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছে যে, "আগ্রাসনের পর এখন শুরু হয়েছে মুক্তি সংগ্রাম (Aggression Ends, Liberation Begins)। মুক্তি ফ্রন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, রিপাবলিকান গার্ডের সদস্যরা, ইরাকি সেনাবাহিনীর স্পেশাল ডিভিশনের প্রাক্তন জওয়ানরা, বিভিন্ন প্রতিরোধ ব্রিগেড এবং বিভিন্ন আরব দেশ থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবীরা যোগ দিয়েছে এই সংগঠনে।

গত ১১ এপ্রিল নাসারিয়াতে আমেরিকার এক নম্বর দালাল, তহবিল তছরূপের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তথাকথিত 'ইরাকি ন্যাশনাল কাউনসিল' নেতা আহমেদ ছালাবিকে হত্যার চেষ্টা করেছিল ন্যাশনাল ফ্রন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনের ব্যক্তিগত বন্ধু ইহুদিবাদী জেনারেল গার্নার (যাকে ইরাকের প্রশাসক হিসাবে প্রথম নিয়োগ করা হয়েছিল) কিম্বা 'বাগদাদের চোর' আহমেদ ছালাবির শাসন ইরাকি জনগণ কখনই মেনে নেবে না।"

অপর একটি প্রতিরোধ সংগঠন সৌদি গুপ্তচরদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে, যদি তারা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইরাক ছেড়ে না যায় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। যুদ্ধোত্তর ইরাকে গোয়েন্দাগিরি চালানোর অভিযোগ এনে সি এন এন, ফক্স ইত্যাদি মার্কিন টিভি চ্যানেল এবং ইজরায়েলি সাংবাদিকদের কাছেও অনুরূপ একটি সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে।

এখন ইরাকে মানুষের মুখে মুখে একথা ঘুরছে যে, খুব শীঘ্রই সাদ্দাম হুসেন কোনও গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে তাঁর দেশবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত একটি আরবি দৈনিক জানিয়েছে, ইরাকি নেতা সাদ্দাম হুসেনের স্বহস্তে লেখা একটি ফ্যাক্স বার্তা গত সপ্তাহে তাদের হাতে এসেছে। সেই বার্তায় ইরাকি নেতা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ-ভাবে বিদেশিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই মার্কিন শাসকরা ইরাকের মুখ্য বিদেশি প্রশাসকের পদ থেকে গার্নারকে সরিয়ে ব্রেমারকে বসিয়েছে।

(সংবাদসূত্র ঃ দি নিউওয়ার্কার (লণ্ডন) ২ মে, ২০০৩)

বৃহত্তম ধর্মঘট অস্ট্রিয়ায়

একের পাতার পর

দুই শহরে বিশ্বায়ন ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ। মিছিলে দুই শহরই ছিল উত্তাল। বিক্ষোভ আটকাতে পুলিশ মারমুখী হয়ে ওঠে। দফায় দফায় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। জলকামানের সাথে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশি আক্রমণে ক্ষিপ্ত জনসাধারণ হাতের কাছে পাওয়া বোতল, গাড়ির টায়ারে আগুন দিয়ে তা ছুঁড়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছে। আঁভিয়ো শহরের মিছিলে একটি বিশাল ফেস্টুনে লেখা ছিল, 'Our world is not for sale' অর্থাৎ 'বিক্রির সামগ্রী নয় আমাদের এ বিশ্ব।' প্রথম দিন জেনিভা শহরে পুলিশের লাঠি চালনায় ৫০০ জন গুরুতর আহত ও ২০০০ জন গ্রেপ্তার হয়। আঁভিয়ো শহরে আহত হয় ৩০ জন এবং গ্রেপ্তার ৫০০০। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও দুই শহরেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

বিশ্বায়ন বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য আঁভিয়োতে ৫০ হাজার পুলিশ ও ২৫ হাজার বহুজাতিক সেনা (ফ্রান্স, জার্মানি ও সুইস সেনা) মোতায়েন করা হয়েছিল। নামানো হয়েছিল সেনাদের গ্রেহাউণ্ড কুকুর ব্রিগেড, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি। আকাশে উড়েছে জঙ্গি বিমান ও হেলিকপ্টার। এতসব আয়োজন সত্ত্বেও বিশ্বায়নবিরোধী বিক্ষোভকে ঠেকানো যায়নি। (সংবাদসূত্র ঃ দি হিন্দু ও ডেকান হেরাল্ড, ৩১ মে এবং ১, ২, ৩ ও ৪ জুন, ২০০৩)

পেনশন হ্রাসের প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল ফ্রান্স

পেনশন বিলের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে ফ্রান্স অচল। কিন্তু সেজন্য দলে দলে শিল্পপতি ফ্রান্স ছেড়ে পুঁজি নিয়ে পালাচ্ছে এমন কোন খবর অবশ্য কারুর জানা নেই।

এই ঘটনার পাশাপাশি আমাদের দেশের দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। এখানে এক-আধদিনের বন্‌ধকে ঘিরে কিছু কিছু সংবাদপত্রে গেল গেল রব পড়ে যায়। মালিকী সংগঠনগুলি মড়াকান্না শুরু করে দেয়। বলে, আন্দোলন হয় বলেই এদেশের উন্নতি হয় না। ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী এদের নাক ঘষে দিয়েছে। মালিকশ্রেণী ও পুঁজিবাদী সরকারের শোষণ থাকলেই মানুষের লড়াই থাকবে। উন্নত অনুন্নত কোন দেশই তার ব্যতিক্রম নয়।

ফ্রান্সের মধ্য ও দক্ষিণপন্থী সরকার পেনশন সংস্কারের নামে নতুন একটি পেনশন বিল পার্লামেন্টে পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছে। এই নতুন পেনশন বিলটি আইনে রূপান্তরিত হলে পেনশনের যেসব সুযোগ-সুবিধা শ্রমিক-কর্মচারীরা পেয়ে আসছে, তা তাদের হারাতে হবে। গত ১৩ মে থেকে পরিবহন শ্রমিক, হাসপাতাল কর্মী, ডাক কর্মী, শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী, অন্যান্য সরকারি কর্মচারী মিলে সংগঠিত শিল্পের মোট ৩০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটে নামে। ধর্মঘটের প্রথম দিনে ধর্মঘটীদের সমর্থনে সারা দেশে ১০০টির বেশি মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। তার মধ্যে ১৫টি মিছিল হয়েছে খোদ প্যারিস শহরে, এতে অংশ নিয়েছিল ৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী। ১৩ মে থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘট এখনও অব্যাহত। ইতিমধ্যে এ ধর্মঘটে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, বন্দর শ্রমিক, টোল আদায়কারী কর্মচারী, সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীরাও যোগ দিয়েছে। এয়ার ট্রাফিক কনট্রোল কর্মীরা ধর্মঘট করায় অন্তর্দেশীয় ও বিদেশি উড়ানের ৮০ শতাংশ বাতিল করতে হয়েছে। গত ২২ দিন ধরে ধর্মঘট চলায় যানবাহন অচল এবং ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গেছে, স্কুল-কলেজ বন্ধ।

সমগ্র ফ্রান্স জুড়ে এখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। তৎসত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বিরক্ত নন। উল্লেখ্য, এ ধর্মঘটের উদ্যোক্তা হচ্ছে ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন CGT ও অন্য বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি।

সম্প্রতি নেওয়া এক জনমত সমীক্ষায় ৫০ শতাংশ ফরাসি জনগণ পরিবহন কর্মীদের ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে, ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করাকে সমর্থন জানিয়েছে। যানবাহনের কর্মচারীদের ধর্মঘটের জন্য প্যারিস, মার্সেই ও লিয়ঁ শহরের নিত্যযাত্রীরা পরিবহনের অভাব ও যানজটে ব্যতিব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু পরিবহন কর্মচারীদের ধর্মঘটকেই সমর্থন জানিয়েছে। (সংবাদসূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ৫ জুন, ২০০৩)

প্রতিবাদে উত্তাল ক্রাকাও এবং সিওল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের প্রস্তাবিত পোল্যাণ্ডসফরকে কেন্দ্র করে গত ৩০ মে প্রায় ১০ হাজার ছাত্র ও যুবক প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক নীতি ও মার্কিন প্রশাসনের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পোল্যাণ্ডের ক্রাকাও শহরে প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশটি হয় ক্রাকাও শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। বিক্ষোভকারীরা বিরাট বিরাট ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে মিছিল সহযোগে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে সভাস্থলে আসে। ব্যানার ও ফেস্টুনগুলিতে লেখা ছিল, "বুশের জিহাদ মুর্দাবাদ", "বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসবাদী বুশ", "মিঃ বুশ এবার কাদের পালা?" ইত্যাদি স্লোগান। (সংবাদসূত্র ঃ এ এফ পি, ১ জুন, ২০০৩)

রামস্‌ফেল্ডকে কালো পতাকা

মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড দুদিনের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সফরে এসে ১ জুন সিওল বিমান বন্দরে নামলে প্রায় ৭০ হাজার দক্ষিণ কোরীয় ছাত্র-যুব তাকে কালো পতাকা দেখিয়েছে। বিক্ষোভকারীরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন সেনা (সংখ্যা ৩৭,০০০) প্রত্যাহারের দাবি জানাবার পাশাপাশি, নতুন করে আর সেনা না পাঠানোর দাবিও তুলেছে। বিক্ষোভ মিছিলে উত্তর কোরিয়ার উপর মার্কিন চাপের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। (সংবাদসূত্র ঃ রয়টার্স, ২ জুন, ২০০৩)

১ জুন জেনিভাতে জি-৮ শীর্ষ সম্মেলন বিরোধী বিক্ষোভ

বিজেপি'র মূল্যবোধের খোলস

চারের পাতার পর

মন্ত্রীত্বে থেকে এস ইউ সি আই নেতারা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার পরীক্ষা দিয়েছেন, জনগণ সেকথা ভুলে যাননি। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া আদর্শের বিরুদ্ধে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একমাত্র এস ইউ সি আই-ই লড়ছে। আর সমস্ত চিন্তাধারা বা পন্থা পুঁজিবাদের সেবা করে, পুঁজিবাদের দালালি করে। আজ যেখানে পুঁজিবাদ অবক্ষয়িত ও দুর্নীতিগ্রস্ত, তার তাঁবেদার দলগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তথাকথিত মার্কসবাদী দল সি পি এম সত্যিকারের কমিউনিস্ট দল না হওয়ায়, মেকী বামপন্থার নামে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বুলি আউড়ে আসলে পুঁজিবাদের সেবা করছে। তাই দুর্নীতি থেকে এ দল বিজেপি-কংগ্রেসের মতই তার নেতা-কর্মীদেরও মুক্ত রাখতে পারেনা।

আন্দোলনের চাপেই ভাড়া কমাতে হবে

একের পাতার পর

বলেন, ৮ জুন রাজ্যে কয়েকটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন এবং ২২ জুন কয়েকটি পুরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে, এখন ভাড়া কমানো হলে নির্বাচন বিধিভঙ্গের দায় এসে পড়বে, ফলে এই সময়ের মধ্যে ভাড়া কমিয়ে তা চালু করা যাবে না। এ বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে নির্বাচন কমিশন জানান এ বিষয়ে (ভাড়া কমানো) রাজ্য সরকার কিছুই জানায়নি। জানালে তা বিচার করে দেখা হবে। প্রশ্ন হল — বাজারে দ্রব্যমূল্যের দাম কমা বা বাড়া কি নির্বাচন বিধির মধ্যে পড়ে? তাহলে তো তেলের দাম কমানো বা বাড়ানো নির্বাচন বিধিতে আটকে যাওয়ার কথা। তাতো আটকাচ্ছে না। বাসভাড়া কমানো বা বাড়ানোকে তাঁরা এখন বাজার দরের মতই এক ব্যবসায়িক রীতিতে পরিণত করেছেন। অথচ পরিবহনমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের মতামত না নিয়ে নিজের মনগড়া একটা অজুহাত তৈরি করে যাত্রী সাধারণকে বোকা বানানোর কৌশল হিসাবে 'নির্বাচনবিধি ভঙ্গের' চাল চালেন। কিন্তু তিনি তাতে সফল হননি।

রাজ্যজুড়ে বাসভাড়া কমানোর দাবিতে এস ইউ সি আই-এর প্রচার, বিক্ষোভ, পথ অবরোধের আন্দোলনে প্রবল জনসমর্থন দেখে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছেন ৭ জুন থেকে ভাড়া কিছুটা কমাতে। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গণআন্দোলনের এ এক উল্লেখযোগ্য জয়। নানা প্রচারে আজ জনমানসে এ ধারণা বহুলাংশে বদ্ধমূল যে, প্রতিবাদ আন্দোলন যাই হোক না কেন, সরকার একবার যা বাড়ায়, তা আর কমানো যায় না। জনসাধারণের এই ধারণা ভেঙে দিল এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন। ভোটের স্বার্থে লোক দেখানো আন্দোলন নয়, ন্যায়সঙ্গত দাবিতে জনগণকে সংগঠিত করে সত্যিকারের গণআন্দোলন যদি গড়ে তোলা যায়, সেই আন্দোলনের চাপে অতি বড় হৃদয়হীন শাসকদেরও মাথা অবনত করিয়ে দাবি আদায় করা যায়।

পরিবহনমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যেসব স্টেজে ৫০ পয়সা ভাড়া বেড়েছে সে স্টেজে ২৫ পয়সা কমবে এবং যে স্টেজে ১.০০ টাকা ভাড়া বেড়েছে সেক্ষেত্রে ৫০ পয়সা ভাড়া কমবে। প্রশ্ন হলো হিসাবনিকাশের কোন্ অঙ্কের ভিত্তিতে এই হারে ভাড়া কমানো হল, তার কোন হদিশ পরিবহনমন্ত্রী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেননি। অথচ এই পরিবহনমন্ত্রী ২০০২ সালের আগস্ট মাসে প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা হারে বাসভাড়া বাড়ানোর সময় (তেলের দাম বেড়েছিল লিটারে ১.৬২ টাকা) বলেছিলেন, "জ্বালানির দাম বাড়লে কেবল বাসভাড়া নয়, সব রকমের পরিবহনের উপরে তার প্রভাব পড়ে। এই ব্যাপারে বাস্তব দিকটা খতিয়ে দেখতে হবে। যেসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তার মধ্যে খুচরো পয়সার অভাবও মাথায় রাখতে হচ্ছে। ন্যূনতম ভাড়া ২ টাকা ২৫ পয়সা করলে যাত্রীরা খুচরো কোথায় পাবেন? এত খুচরো কণ্ডাক্টররা বা কোথায় পাবেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুচরোর ব্যাপারে সি এস টি সি-র জন্য কিছু কোটা রেখেছে। সেটা যথেষ্ট নয়।" (আনন্দবাজার ৬-৭-০২)।

যে ক্ষেত্রে স্টেজে ২৫ পয়সা ভাড়া বাড়ালে তেলের বর্ধিত দাম উসুল হয়ে মালিকরা বাড়তি লাভও পেয়ে যেতেন, সেক্ষেত্রে খুচরোর অভাবের অজুহাতে পরিবহনমন্ত্রী স্টেজ প্রতি ৫০ পয়সা ভাড়া বাড়িয়ে বাস মালিকদের স্রেফ ২৫ পয়সা প্রতি স্টেজে যাত্রীপিছু বাড়তি বোনাস পাইয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরিবহনমন্ত্রী বর্তমানে স্টেজে মাত্র ২৫ পয়সা ভাড়া কমাচ্ছেন কোন্ যুক্তিতে? এক্ষেত্রে কি খুচরো পয়সার সমস্যা হবে না? মালিকদের স্বার্থ দেখার সময় খুচরোর সমস্যাটা সমস্যা নয়, যাত্রীদের ক্ষেত্রে এটা একটা সমস্যা, পরিবহনমন্ত্রীর এ দ্বিচারিতা কতদিন চলবে?

২০০৩ সালের ১ এপ্রিল বাসভাড়া বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্টেজ প্রতি ৫০ পয়সা শুধু বাড়ানো হয়নি, পুরনো স্টেজ ভেঙে দিয়ে দূরত্ব কমিয়ে স্টেজের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল এবং ভাড়াও বাড়ানো হয়েছিল। অর্থাৎ, বাসমালিকদের দুদিক থেকে লাভ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল। যাত্রীদের ক্ষোভকে চাপা দিতে ১-৬ কিমি প্রথম স্টেজকে ভেঙে ১-২ কিমি ও ২-৬ কিমি দুটো স্টেজে ভাগ করা হয় যেখানে ১-৬ কিমি পর্যন্ত ২.৫০ টাকা ভাড়া ছিল, তা পরিবর্তন করে ১-২ কিমি এর ভাড়া করা হলো ২.০০ টাকা, এবং ২-৬ কিমি-এর জন্য ৩.০০ টাকা। পরিবহনমন্ত্রী বললেন জনগণের স্বার্থের কথা ভেবে ১-২ কিমি একটি নতুন স্টেজ করে ভাড়া ৫০ পয়সা কমিয়ে দিয়ে ২.০০ টাকা করা হলো। আসলে শুধু অযৌক্তিক এবং অত্যধিক ভাড়াবৃদ্ধির ফলে যাত্রীদের ক্ষোভকে চাপা দিতে পরিবহনমন্ত্রী এই কৌশল ব্যবহার করেননি, স্টেজ ভেঙে ছোট করার যে পরিকল্পনা পরিবহনমন্ত্রীর মাথায় ছিল তা পরের বার ভাড়া বাড়ানোর সময় প্রকাশ হলো। এক্ষেত্রে যাত্রীদের পকেট কেটে মালিকদের পকেট ভরানোর যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা পরিবহনমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের মাথায় ছিল তা প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রদর্শিত সারণি থেকে প্রমাণিত হয় দূরত্ব কমিয়ে স্টেজের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং স্টেজভিত্তিক ভাড়া বাড়ানোর রীতির ফলে বাসমালিকদের অধিকতর লাভ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০০২ সালের ১ আগস্ট ভাড়া বাড়ানোর সময় পরিবহনমন্ত্রী বুঝেছিলেন তেলের দাম মাত্র ১.৬২ টাকা বৃদ্ধির জন্য ৫০ পয়সা প্রতি স্টেজে ভাড়াবৃদ্ধি যাত্রী সাধারণকে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি যাত্রীদের কথার চাতুরীতে বিভ্রান্ত করে ৫০ পয়সা ভাড়াবৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য করতে বলেছিলেন, বাসভাড়া যে ১৫% বাড়ানো হলো তার ৬ শতাংশ তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য এবং বাকি ৯ শতাংশ যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য। 'আগামী ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি বাসগুলির হাল ফেরানোর কথা ঘোষণা করে মন্ত্রী বলেন, শহরে এরকম বিশ্রী বাস থাকায় দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাই নেই। তাই ঠিক হয়েছে, বাসের হাল ফেরানো হবে। নতুন ভাড়ার মধ্যে এই হাল ফেরানোর খরচের অংশ থাকবে।' (আনন্দবাজার ৮-৭-২০০২)

এই যে ৯ শতাংশ বাড়তি ভাড়া যাত্রীদের পকেট কেটে আদায় করা হচ্ছে, তা খরচ করে বাসের হালের কিন্তু আজও পর্যন্ত কোন পরিবর্তন করা হয়নি। এই বাড়তি মুনাফা বাসমালিকদের পকেটেই গিয়েছে।

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে ২৩ মে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পথ অবরোধ

কলকাতার বাসের হাল সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের ডি সি ট্রাফিক মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিংহ বলেছিলেন — "কলকাতার রাস্তায় চলা বাসের প্রায় সবই সাব-স্ট্যান্ডার্ড। প্রাগৈতিহাসিক বলতে পারেন। হয়তো দু-একটা বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েরও বাস পাওয়া যেতে পারে! বাসে ওঠাটা আপনার হাতে, কিন্তু কখন, কোথায় পৌঁছবে, তা আপনার জানার কথা নয়।" (আনন্দবাজার ১৪-৪-০২ জয়ন্ত বসুর লেখা) বাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি তো দূরের কথা পরিবহন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী "বসার জন্য কমপক্ষে দুই বর্গফুট জায়গা, হেলান দেওয়ার জন্য দেড়ফুট, পা ছড়ানোর জন্য জায়গা, সিটে কুশন। দরজার সিঁড়ি এক-দেড় ফুটের বেশি উঁচু হবে না। ছাদ থেকে জল পড়বেনা, জানালা বা আলো ঠিকঠাক থাকবে। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি যাত্রী দাঁড়ানোর জন্যও নেওয়া যাবে না। টায়ারে তাপ্পি মেরে চালানো চলবে না। নিত্যযাত্রী জানেন এসব চিন্তা করাও কষ্ট কল্পনা।" (ঐ) কেবল তাপ্পি দেওয়া টায়ারের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একাধিক বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার বলি হয়েছে বহু মানুষ।

প্রতিবারে ভাড়া বাড়ানোর সময় পরিবহন-মন্ত্রী বলেন, "আমরা এমনভাবে নতুন ভাড়ার হার ঠিক করতে চাইছি, যাতে কিছুদিন অন্তত তা বজায় রাখা যায়।" (আনন্দবাজার ৮-৭-০২)

প্রতিবার ভাড়া বাড়ানোর সময় তেলের দাম যা বেড়েছে তার ভিত্তিতে ভাড়া বাড়ানো হয় না, ভাড়া বাড়ানোর পর আরো দু'তিন বার তেলের দাম বৃদ্ধি হলেও বাসমালিকদের যাতে লোকসান না হয় তার ভিত্তিতে ভাড়াবৃদ্ধির হার ঠিক করা হয়। ফলে এক্ষেত্রেও বাসমালিকদের অধিক মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অথচ তেলের দাম পরবর্তী স্তরে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসমালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি তোলে এবং সরকারও ভাড়া বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে প্রতিবার বাসভাড়া বৃদ্ধিতে মালিকদের মুনাফার হার ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। অথচ ভাড়া কমানোর ক্ষেত্রে যেখানে শুধু বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা নয়, তার থেকেও ভাড়া আরও কমানো উচিত এবং তা যুক্তিসঙ্গত, সেখানে রাজ্য সরকার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্দোলনের চাপে বর্ধিত ভাড়ার মাত্র ৫০ শতাংশ কমালো। রাজ্য সরকারের এই মালিকতোষণ নীতিকে পরাভূত করতে হলে চাই আরো সংগঠিত লাগাতার তীব্র গণআন্দোলন। আন্দোলন ছাড়া এই সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের আর বিকল্প কোন পথ নেই।

ভাড়াবৃদ্ধি হয় ১ নভেম্বর ২০০০

দূরত্ব	ভাড়া
১ম স্টেজ ০-৬ কিমি	২.৫০ টাঃ
৬-১৬ কিমি	৩.০০ টাঃ
১৬-১৮ কিমি	৩.৫০ টাঃ
১৮-২২ কিমি	৪.০০ টাঃ
২২-২৬ কিমি	৫.০০ টাঃ

এরপর প্রতি স্টেজে ১.০০ টাকা বৃদ্ধি, সর্বোচ্চ ৮.০০ টাকা বৃদ্ধি।

ভাড়াবৃদ্ধি হয় ১ আগস্ট ২০০২

দূরত্ব	ভাড়া
০-২ কিমি	২.০০ টাঃ
২-৬ কিমি	৩.০০ টাঃ
৬-১৮ কিমি	৪.০০ টাঃ
১৮-২২ কিমি	৫.০০ টাঃ
২২-২৬ কিমি	৬.০০ টাঃ

এরপর স্টেজ প্রতি ১.০০ টাকা হারে বৃদ্ধি।

ভাড়াবৃদ্ধি হয় ১ এপ্রিল ২০০৩

দূরত্ব	ভাড়া
০-৪ কিমি	৩.০০ টাঃ
৪-৮ কিমি	৩.৫০ টাঃ
৮-১২ কিমি	৪.০০ টাঃ
১২-১৬ কিমি	৪.৫০ টাঃ
১৬-২০ কিমি	৫.০০ টাঃ
২০-২৪ কিমি	৫.৫০ টাঃ

এরপর প্রতি স্টেজে ১.০০ টাকা বৃদ্ধি।

ভাড়া কমানো হয় ৭ জুন ২০০৩

দূরত্ব	ভাড়া
০-২ কিমি	২.৫০ টাঃ
২-৪ কিমি	৩.০০ টাঃ
৪-৮ কিমি	৩.২৫ টাঃ
৮-১২ কিমি	৪.০০ টাঃ
১২-১৬ কিমি	৪.২৫ টাঃ
১৬-২০ কিমি	৫.০০ টাঃ
২০-২৪ কিমি	৫.২৫ টাঃ

এরপর প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা বৃদ্ধি।

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে ২৩ মে শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ

বিদ্যুৎ বিল ২০০৩

গরিব ও মধ্যবিত্তের জীবনে বিদ্যুৎ বিলাসদ্রব্যে পরিণত হবে

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ সম্প্রতি সংসদে পাস হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইনে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ে 'প্রতিযোগিতা সৃষ্টি'র অজুহাতে ক্রেতাদের সামনে খোলা বাজার তৈরির যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং যেভাবে রাখা হয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত গরিব ও মধ্যবিত্তদের কাছে বিদ্যুৎ বিলাসদ্রব্যে পরিণত হবে। কারণ নতুন ব্যবস্থায় যে গ্রাহক যত কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে তার কাছ থেকে তত বেশি হারে দাম আদায়কে আইনসম্মত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ এসেছে বিদ্যুৎ বিল ২০০১-এর ধারাবাহিকতায়। বিদ্যুৎ বিল ২০০১-এ বলা হয়েছিল — বিদ্যুতের দামে কোনও ভর্তুকি থাকবে না। উৎপাদনের খরচ অনুযায়ী নয়, সরবরাহ করার খরচ অনুযায়ী বিদ্যুতের দাম নির্ধারিত হবে। বিদ্যুৎ শিল্পকে মুনাফা লোটার ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য ইতিমধ্যেই বেসরকারীকরণ করার সাথে সাথে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বন্টন — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন সঞ্চালক ও বন্টনকারী কোম্পানি, উৎপাদকের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করে লাভ করতে পারে। প্রত্যেক স্তরে ১৬ থেকে ২০ শতাংশ মুনাফা আইনসঙ্গত করার পাকা ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করে ফেলেছে। অতীতে উৎপাদন-সঞ্চালন-বন্টন তিনটি কাজই একসঙ্গে করে একটি সংস্থাই মুনাফা করত এবং এক্ষেত্রে তিনটি স্তর মিলিয়ে বেসরকারি সংস্থা ১৬% আর সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ৩%-এর বেশি মুনাফা করতে পারতো না। এখন তিন স্তরে মোট ৪৮ থেকে ৬০ শতাংশ মুনাফার ব্যবস্থা করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিশাল বোঝা চাপানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। সবটাই করা হচ্ছে বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী বেসরকারীকরণ করার এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকেও তথাকথিত 'ভর্তুকিহীন বাজার দরে' ক্রেতাদের কিনতে বাধ্য করার জন্য। তথাকথিত 'বাজারদর' এইজন্য যে পূর্ণাঙ্গ শিল্পটি ভেঙে স্তরে স্তরে আলাদা আলাদা মুনাফা যোগ করার পর যে বর্ধিত দামটি দাঁড়াচ্ছে, তাকেই উদারীকরণের সর্বভারতীয় প্রবক্তারা এবং তাদের কাঁসিদার সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বলছে — বিদ্যুতের 'বাজারদর'। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে'র হরেক রকম অজুহাতে মাশুলবৃদ্ধির ফতোয়া এবং রাজ্য সরকারের নিজস্ব ট্যাক্স।

সকলেই জানেন, নামে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হলেও বাস্তবে এটি 'দাম বাড়ানো কমিশনে' পর্যবসিত হয়েছে। সি ই এস সি বা এস ই বি-র অপকর্মের কোনও নিয়ন্ত্রণ কমিশন করে না। লো-ভোল্টেজ, লো-ফ্রিকোয়েন্সি, ঘন ঘন লোডশেডিং — এসব নিয়ন্ত্রণে কমিশনের কোন ভূমিকা নেই। অর্থাৎ বিদ্যুতের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নয়, মাশুল বৃদ্ধির ফিকির খোঁজাই কমিশনের কাজ। ফলে বাস্তবে কমিশনকে ঢাল হিসাবে রেখে কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই বোঝাপড়া করে দাম বাড়াচ্ছে, যার বিরুদ্ধে গ্রাহক আন্দোলন ও আইনি প্রক্রিয়া, দু রাস্তাতেই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২ সালের বিদ্যুৎ মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে চলতেই বিষয়টি আদালতে যায়। মাশুলবৃদ্ধির সুপারিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন হাইকোর্টে যখন যায় তখন রাজ্য সরকার নীরব থেকে বাস্তবে মাশুলবৃদ্ধির পক্ষে দাঁড়ায়। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গেলেও রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ করে থাকে। পরে অভিন্ন মাশুলের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হওয়ায় ভয় পেয়ে সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন থাকায় মানুষকে বিভ্রান্ত করতে রাজ্য সরকার অভিন্ন মাশুলনীতি চালু করার ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন করে এবং স্থগিতাদেশ পায়। সেই মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও গত ২৩ এপ্রিল বিদ্যুৎ কমিশন পুনরায় অভিন্ন মাশুল নীতির ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী মাশুলবৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকারও নীরব থেকে তা চালু হতে দেওয়ায় মে মাস থেকে ইউনিট প্রতি সি ই এস সি এলাকায় ২৫ পয়সা এবং এস ই বি এলাকায় ৫২ পয়সা বাড়তি দাম আদায় শুরু হয়েছে।

এর উপর সি ই এস সি গ্রাহকদের বিলে তারকাচিহ্ন দিয়ে ফতোয়া দিয়েছে সিকিউরিটির (জামানতের) টাকা বাড়ানো হচ্ছে। কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন এর তীব্র বিরোধিতা করে দেখিয়েছে, এভাবে জামানত বাড়ানোর কোনও আইনি বা নৈতিক ভিত্তিই নেই। অ্যাসোসিয়েশন বলেছে — ".... বর্ধিত সিকিউরিটি আদায়ের ব্যাপারে সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, বিদ্যুৎ আইন থেকে শুরু করে হাইকোর্টের এমন কি সুপ্রিমকোর্টের পূর্বতন রায় কোনও কিছুরই পরোয়া করছে না। সি ই এস সি কানেকটেড লোডের ভিত্তিতে নিজের মর্জি মতো তৈরি তিন মাসের বিলকে সিকিউরিটি হিসাবে গ্রাহকদের কাছে দাবি করছে, আর রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কানেকটেড লোডের ভিত্তিতে তৈরি দু-মাসের বিলকে সিকিউরিটি হিসাবে দাবি করছে। আর গ্রাহকরা এই টাকা জমা না দিলে ৭দিনের নোটিসে লাইন কেটে দেবার নির্দেশ দিয়েছে — যা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার এই সাহস সি ই এস সি পাচ্ছে কোথা থেকে ? রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি সরকারি সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও এসব বেআইনি কাজ করছে কী করে ? তার কারণ হল, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ সমর্থন। যৌথ নীতি।" (দ্রঃ কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকা, 'বিদ্যুৎ' মে-২০০৩ সংখ্যা)

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ শিল্প বেসরকারীকরণের কাজটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেই করছে, কিন্তু নিজেদের জনমুখী দেখিয়ে লোক ঠকাবার জন্য প্রকাশ্যে সি পি এম তা স্বীকার করছে না। বরং দিল্লিতে বিদ্যুৎ বিল ২০০৩-এর উপর সংশোধনী এনে, রাজ্যসভায় ওয়াক আউট করে ; কেরালায়, যেখানে তারা ক্ষমতায় নেই সেখানে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সি পি এম দেখাতে চাইছে যেন তারা এসবের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের দুমুখো নীতি আর গোপন থাকছে না।

পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে তারা অভিন্ন মাশুলনীতি আপাতত ঠেকিয়ে রাখার জন্য হাইকোর্টে গেলেও নীতিগতভাবে তারা এর বিরোধী নয়। ২০০২ সালের ৩ জানুয়ারি দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বিদ্যুতের দামে পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেওয়ার নীতি যখন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাতে সই দিয়েছিলেন শুধু নয়, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য যেখানে তারা অভিন্ন মাশুল নীতি প্রয়োগ শুরু করেছে। তারা বলছে, ধাপে ধাপে তারা অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করার পক্ষপাতী। এই মর্মে গত ২৯মার্চ বিধানসভায় তারা বিল পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির সইয়ের জন্য পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ তারাও কেন্দ্রের মতই গ্রাহকমারা নীতি প্রয়োগ করবে। তবে পার্থক্য এই যে, বামপন্থী বুলির আড়ালে তারা এক কোপে না কেটে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গ্রাহকদের গলা কাটতে চায়।

সি পি এম নেতারা বলতে পারেন — কেন্দ্র বিদ্যুৎ বিল ২০০৩ চালু করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে এবং বেসরকারীকরণ করছে। কাজেই এর জন্য কেন্দ্র দায়ী ; রাজ্যের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। এও সত্যের অপলাপ। দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম আগ বাড়িয়ে অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করার কোন বাধ্যবাধকতা তাদের ছিল না। অথচ মুখে 'ধীরে চলো' নীতির কথা বললেও আসলে সেটাও তারা চাইছে না, তারা যত দ্রুত সম্ভব গোয়েঙ্কার লুঠের এবং গ্রাহকদের পকেট কাটার ব্যবস্থাই করতে চায়, কিন্তু সেটা তারা করতে চায় চালাকি করে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। ভাল করে জনসাধারণের পকেট কাটাও যায়, অথচ তাদের জনবিরোধী চরিত্রও না ফাঁস হয়। তাই তারা ক্রমাগত মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে। সি পি এম চাইলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে চাপ সৃষ্টি করতে পারত। তাও তারা করেনি। এমনকি সংসদের চৌহদ্দির মধ্যেও তারা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিলের নিঃশর্ত বিরোধিতা করেনি। কেন্দ্রের পুরোপুরি স্বৈরাচারী বিদ্যুৎ বিলেও ভর্তুকির প্রশ্নে বলা আছে, রাজ্য ইচ্ছে করলে তার নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দিয়ে ভর্তুকি চালু রাখতে পারে।

ভারতবর্ষের বেশির ভাগ রাজ্যে এখনও বিদ্যুতে ভর্তুকি চালু রয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়েছে কেন ?

প্রশ্ন হল, রাজ্য সরকার যদি শিল্পপতিদের সস্তায় জমি, বিদ্যুৎ, জল দিতে পারে, একাধিক বছর কর ছাড় দিতে পারে, মন্ত্রী-আমলাদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারে, তবে দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ, চাষি সম্প্রদায়ের জন্য ভর্তুকি দিয়ে বিদ্যুতের দাম কম রাখবে না কেন ?

রাখবে না এই জন্য যে তারাও শুধু বিদ্যুৎ নয়, সমস্ত অত্যাবশ্যক পরিষেবা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার সরকারি দায়িত্ব অস্বীকার করছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে শিল্প মালিক ও বৃহৎ গ্রাহক থেকে ক্ষুদ্র গ্রাহক ও গৃহস্থদের জন্য পৃথক দাম রাখার যে রীতি স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই চালু ছিল, যা কোনমতেই পারস্পরিক ভর্তুকি নয়, তাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী

আটের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রশান্ত দাসের জীবনাবসান

মাত্র ছাপান্ন বছর বয়সে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যাণ্ড হস্‌পিটালে মেনিনগো এন্‌সেফেলাইটিস টাইপ-২তে আক্রান্ত হওয়ার দরুন ক্রনিক কার্ডিও এ্যাজমার রোগী কমরেড প্রশান্ত দাসকে মৃত্যু অকালে ছিনিয়ে নেয় ৩০ মে ভোর ৫-১২ মিনিটে।

কমরেড প্রশান্ত দাস '৬০-এর দশকের শুরুতেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি সারা মুর্শিদাবাদ জেলায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন। পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিক, রিক্সাচালক, গরিব হরিজনদের মধ্যেও সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যও পরিশ্রম করেছেন দিবারাত্র। তিনি জেলায় যুব সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য 'ভাবীযুগ' পত্রিকা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন সহ প্রতিটি গণআন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে তিনি ছাত্রনেতা এবং বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিলেন।

নিম্নবিত্ত পরিবারের বাড়ির বড় ছেলে হয়েও সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্যারিয়ার তুচ্ছ করে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে তিল তিল করে দল গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রামে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম জেলা কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসাবে পরিচিতি ছিল তাঁর সংগ্রামের যোগ্য স্বীকৃতি।

পরিবারের মধ্যেও দলের চিন্তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ফলে তাঁর স্ত্রী মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী হতে পেরেছেন এবং সমস্ত আন্দোলনে অংশ নেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মধ্যে দলীয় চিন্তার প্রভাবের দরুন শেষকৃত্যে তারা কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেননি। কংগ্রেসী ও পরবর্তীকালে সি পি এমের দুষ্কৃতীদের আক্রমণ, জেল খাটা — কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। ব্যক্তিগত, সাংসারিক ও মানসিক সমস্যার নানা টানাপোড়েনে দীর্ঘ কয়েক বছর, মনে প্রাণে দলের প্রতি ভালবাসা থাকলেও, দলীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেননি। পরবর্তীকালে '৯০ দশকের শেষদিকে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সাংগঠনিক কাজে, আন্দোলনের ময়দানে। ততদিনে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। গরিব মানুষদের তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। দলের মেডিক্যাল ফ্রন্টের দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করেছেন। সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও গত '৯৮ ও ২০০০-এর বন্যায় তিনি রিলিফ ক্যাম্পে অংশ নিয়েছেন। শেষ অধ্যায়ের দিনগুলিতে তিনি তাঁর হাতে রিক্রুট করা কমরেডদের নেতৃত্বেও কাজ করে বিপ্লবী নৈতিকতার এক প্রেরণাময় দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

কমরেড প্রশান্ত দাস লাল সেলাম

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪৩২ সংখ্যা

মুখ্যমন্ত্রীর ইতালি সফর

কী বিপদ! বোম্বাইতে মালিকদের সভায় ধর্মঘটবিরোধী অগ্নিবর্ষী বাণী দিয়া মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু যেমনি ইতালি ছুটিয়াছেন ওমনি সেখানে আন্দোলনের ধুম পড়িয়াছে। গেরো আর কাহাকে বলে! অকস্মাৎ যদি ইতালির ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর লালঝাণ্ডা দেখিয়া ধোঁকা খাইয়া ধর্মঘটীদের সভায় তাঁহাকে ভাষণ দিবার আমন্ত্রণ জানায়, তাহা হইলে বিপদের এক শেষ!

অবশ্য মালিকদের সভায় ধর্মঘটবিরোধী হুমকি দিয়া শ্রমিক সভায় সংগ্রামের গরম বুলি চালাইতে মুখ্যমন্ত্রী অপারগ নন। এ-অভ্যাস ছাব্বিশ বছরে তাঁহারা ভালই রপ্ত করিয়াছেন। দেশের ভিতর হইলে ঘাবড়াইবার কারণ ছিল না, কারণ এদেশের মালিকরা তাঁহাদের মুখে আগুনে বাণী শুনিয়া ভয় পান না। এ শীতল অগ্নি, এক আশ্চর্য বস্তু! ইহার দীপ্তি আছে তবে তাপ নাই, ইহাতে হাত পোড়ে না। কিন্তু ইতালির মালিকশ্রেণী যদি তা না বোঝে!

পূর্বসূরী জ্যোতিবাবু প্রতি বছর পুঁজিপতি ধরিতে বিলাত যাইতেন, বুদ্ধদেববাবু সেই রীতি বহাল রাখিয়াছেন। সাহেবী কেতা বটে, ইংলণ্ডে ধনী সাহেবরা যেমন সিজিন পড়িলে বনে যায় শিয়াল মারিতে। শিয়াল না মারিলেও, অরণ্যভ্রমণ মারে কে? জ্যোতিবাবুও পুঁজিপতি ধরিতে পারুন না পারুন, ফেরার পথে লণ্ডনে নিজের চিকিৎসা করাইয়া ফিরিতেন।

বুদ্ধদেববাবু সময়টিও বাছিয়াছেন জববর! ইতালিতে শুধু নয়, পুরা ইউরোপে এখন ধর্মঘট, পথ অবরোধ চলিতেছে। ফলে নিশ্চয় পুঁজিপতিরা এখন পুঁজি লইয়া দেশত্যাগ করিবে। অন্তত মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল এখন এই কথাই বলেন। কাজেই মাহেন্দ্রক্ষণ! কেবল সীমান্তে দাঁড়াইলেই হইল। আন্দোলনের ফলে পুঁজিপতিরা ইতালি ছাড়িলেই তাহাদের খপাখপ্ ধরিয়া ঝুলিতে পুরিবেন আর বলিবেন — "আমাদের রাজ্য শান্তির দ্বীপ, সেখানে শ্রমিক আন্দোলন নাই। আমরা তাহার গোড়া কাটিয়া দিয়াছি। আসুন আসুন পশ্চিমবঙ্গে! হাত ঘুরু ঘুরু নাড়ু দিব, সস্তায় জমি দিব, জল দিব, বিদ্যুৎ দিব, ট্যাক্সেও ছাড় দিব।'

তবুও যদি তাহারা না বোঝে তো বুঝাইবার জন্য সঙ্গে মালিকটানায় অভিজ্ঞ সঙ্গী লইয়াছেন। ওস্তাদ শিকারী যেমন বুনো হাতি ধরিতে শিক্ষিত কুনকি হাতি লইয়া যায়, মুখ্যমন্ত্রীও তেমন চেম্বার্স অব কমার্সের কিছু কর্তা সঙ্গে লইয়াছেন। বেয়াড়া প্রশ্নের চোখা উত্তরও তৈরি রাখিয়াছেন। মালিকরা বলিতে পারে — ওরে বাবা, ভারতবর্ষ, ওখানে রামরাজত্ব চলিতেছে, বড় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিন্দুর দাপট, আমরা আবার ক্রিশ্চান।" উত্তর তৈরি — "না ভারত নয়, এ পশ্চিমবঙ্গ, এখানে দাঙ্গা হয় না। এখানে বাজপেয়ী আদবানী নাই। আছেন তথাগত। তথাগতও যিনি বুদ্ধদেবও তিনি। তাই মাভৈঃ।"

কিন্তু তাহাতেও যদি পুঁজিপতিরা পুঁজি খাটাইতে রাজি না হয়! যদি প্রশ্ন করে — বাজার কই, মাল বেচিব কোথায়? তাহাতেই বা কি? শিল্পায়ন যে হইবে না তাহা যদু মধুও জানে। তবে শিল্পায়ন, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি হচ্ছে হচ্ছে ভাব চাই। এখন পাবলিককে উন্নয়নের ধোঁকা দিয়া ভোট আদায়ের দিন। দিল্লীতে বাজপেয়িজি এখন 'বিকাশ পুরুষ', রাজ্যে বুদ্ধদেববাবুরও এখন "বিকাশ পুরুষ" গোছের ইমেজ চাই। শিল্পায়নের লেজ ধরিয়া আগামী ভোটে গদির দখল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই হইল। পুঁজিপতি ধরা পড়িল কিনা সে প্রশ্ন গৌণ!

এম পি-দের জন্য ঢালাও সুযোগ

একের পাতার পর

টেলিফোন ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য গোড়ায় গ্রাহকদের তিনরকম সুবিধা দেওয়া হত। এক, রেন্টাল চার্জ অর্থাৎ ভাড়া কম রাখা হত। দুই, ফ্রি কল করার ব্যবস্থা রাখা হত। তিন, কল চার্জ অর্থাৎ ফ্রি কল বাদে প্রতিবার ফোন করার জন্য দেয় মূল্য কম রাখা হত। অবশ্য কতবার ফোন করা হল এটা গুনতে কতক্ষণ কথা বলা হচ্ছে তা দেখতে হয়। এতদিন পর্যন্ত সাধারণ ঘরের ফোনে প্রতি তিন মিনিটে একবার কল ধরা হত।

সরকার এখন টেলি-পরিষেবা থেকে হাত গুটিয়ে এর বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। এখন সরকারি সংস্থার নাম ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। নানারকম বাগাড়ম্বরের আড়ালে এ বছরের মে মাস থেকে বি এস এন এল টেলিফোন পরিষেবার চার্জ বদলে যে জটিল কাঠামোটি প্রকাশ করেছে তার জন্য এই সংস্থার নীতিনির্ধারক অফিসারদের বেশ কসরৎ করতে হয়েছে বোঝা যায়। তবে কাঠামো জটিল হলেও মূল কথাটা খুবই সরল। বেশ কিছুদিন ধরে টেলিফোনের ব্যয় বাড়ানোর যে রীতি চলছিল তার মধ্যে রয়েছে রেণ্টাল চার্জ বাড়ানো, ফ্রি কলের সংখ্যা কমানো, আর কলচার্জ বাড়ানো। বি এস এন এল এবারও এই একই ধারায় এগিয়েছে। শুধু তফাৎ এবার তারা গ্রাহকদের কয়েকরকম শ্রেণী বিভাগ করে দিয়ে, বিভিন্ন শ্রেণীকে (যেমন জেনারেল, ইকনমি, স্পেশাল ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা চালু করেছে। ভাবখানা হল যার যেমন প্রয়োজন ও সামর্থ্য সেইমত ঠিক করে নেবেন কোন্ শ্রেণীতে থাকবেন। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ফোনের খরচ নানা উপায়ে বাড়ানোই হয়েছে। যেমন সর্বনিম্ন জেনারেল শ্রেণীতে ফ্রি কলের সংখ্যা যা ছিল তার অর্ধেকেরও নীচে নামিয়ে; স্পেশাল শ্রেণীতে কলচার্জ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে এ নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হওয়ায় সর্বনিম্ন জেনারেল শ্রেণীতে ফ্রি কল মাসে ত্রিশের জায়গায় পঞ্চাশ করা হয়েছে (আগে ছিল দু'মাসে ১৫০ হিসাবে মাসে ৭৫)। কিন্তু মাসে ১০০ থেকে ৫০০ কল করেন যেসব গ্রাহক, জেনারেল শ্রেণীতে তাদের বিল আগের থেকে অন্তত দশ থেকে সতের শতাংশ বাড়বে। তাছাড়া আগের রীতি অনুযায়ী দু'মাসে হিসাব না করে, প্রতি মাসে বিলের হিসাব করা হলে, যে সব গ্রাহক কম ফোন করেন তাদের ক্ষতি হবে। প্রতি মাসে গুণে গেঁথে পঞ্চাশটা ফ্রি কল করতেই হবে। কোনো কারণে এক মাসে চল্লিশটা কল হলে ও আরেক মাসে ষাটটা কল হলে চলবে না।

অর্থাৎ সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে টেলিফোনের মত আজকের জীবনে আবশ্যকীয় পরিষেবার খরচ নিশ্চিতভাবেই বাড়তে চলেছে।

কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে কি ঘটছে? কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ সমস্ত সাংসদ দু'টি টেলিফোন রাখতে পারেন — একটি দিল্লীর ঠিকানায়, অপরটি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্রে অথবা পছন্দসই অন্য কোন জায়গায়। তাছাড়া তাঁরা ব্যবহার করুন বা না করুন, তাদের টেলিফোনে 'ইন্টারনেট'-এর সুযোগও থাকে। স্বভাবতই এ সবের জন্য কোনও রেণ্টাল তাদের দিতে হয় না। উপরন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ থাকে অঢেল ফ্রি কল। ১৯৮৭ সালে এর পরিমাণ ছিল বছরে ১৫০০০। ১৯৯৮ সালে, অর্থাৎ ১১ বছরে তাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে বছরে ১ লাখ এবং ২০০১ থেকে এই ফ্রি কলের সংখ্যা প্রতি সাংসদের জন্য হবে বছরে মাত্র দেড় লাখ। অর্থাৎ জেনারেল শ্রেণীভুক্ত একজন গ্রাহক তার নিতান্ত প্রয়োজনের টেলিফোনের জন্য যেখানে বছরে তিন হাজার টাকা রেন্টাল ও তার উপর ট্যাক্স দিয়ে মোট ছ'শটি ফ্রি কল পাবে, একজন সাংসদের ক্ষেত্রে তার সংখ্যা কোন রেণ্টাল না দিয়েই মাত্র আড়াই শ' গুণ কল বেশি! তাছাড়া সাধারণ গ্রাহককে তার জন্য নির্দিষ্ট ফ্রি কলের সুযোগটাকে এক মাসের মধ্যেই যে করে হোক নিতে হবে। কিন্তু মন্ত্রীরা যদি এক বছরে তাদের জন্য বরাদ্দ দেড় লাখ ফ্রি কলের বেশি কল করে ফেলেন, তার জন্য তাদের চার্জ যে দিতেই হবে তা নয়। কারণ তাঁরা এই বাড়তি কল পরের বছরের হিসাবের সঙ্গে 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে পারবেন। ফলে বুঝে দেখুন, 'গণতন্ত্রে সবাই সমান" বটে, তবে একজন সাধারণ গ্রাহকের সঙ্গে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এমনকি একজন সাংসদের ফারাক কতটা!

সেই সঙ্গে এও মনে রাখা দরকার, টেলিফোন ছাড়াও বিশাল অঙ্কের বেতন, রাহাখরচ ছাড়াও লিখিত-অলিখিত আরও কত সুযোগ তাঁরা পেয়ে থাকেন! টেলিভিশনের দৌলতে আজকাল আমরা স্বচক্ষে সংসদের অধিবেশনে সাংসদদের আচার-আচরণের যে নমুনা দেখতে পাই, তাকে মাথায় রেখে মনে করা যেতে পারে — ঐ সংসদের একদিনের অধিবেশনের জন্য খরচ হয় দু'কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। এর বেশিটাই যায় সাংসদদেরই পিছনে।

সব দেখেশুনে একটা কথাই বলতে হয়, এমন মহার্ঘ জনপ্রতিনিধি সম্প্রদায়, সাধারণ মানুষের থেকে যাঁরা হাজার হাজার গুণ আলাদা — সত্যিই, তাদেরই ত অধিকার থাকা উচিত, টাকা নেই বলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সবরকম জরুরি পরিষেবার জন্য জনগণের কাছ থেকে বেশি বেশি করে টাকা আদায় করার!! কিন্তু সমস্যা হল, জনগণের টাকায় নির্বাচিত হয়ে জনগণেরই টাকায় আবুহোসেনি করার এবং তার বিনিময়ে মালিকদের তুষ্ট করতে জরুরি পরিষেবাগুলিকে পর্যন্ত জনগণের সামর্থ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা চালু করার অধিকার জনপ্রতিনিধিরা পেল কোথা থেকে — জনগণ যদি তাদের কাছ থেকে সেই জবাব চায়? তারা কি উত্তর দেবেন?

স্কুলে ভর্তি ফি কমাতে বাধ্য হলেন স্বৈরাচারী সম্পাদক

কোচবিহার জিলার পেস্টারঝাড় হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক তথা সি পি এম নেতা ও জিলা পরিষদ সদস্য ধনঞ্জয় রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছাত্র-অভিভাবকদের বলেছিলেন পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ১৬০ টাকা দিতে হবে, এক টাকাও কম নেওয়া হবে না। সি পি এমের মস্তানবাহিনীকে স্কুলে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে জবরদস্তি করে অভিভাবকদের কাছ থেকে ১৬০ টাকা আদায়ও করছিলেন। কিন্তু ছাত্র ও কিছু অভিভাবক এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ৮ জন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী ডি-আই অফিসের সামনে আমরণ অনশনে বসেন। অনশনের ৬ষ্ঠ দিন অতিক্রান্ত হলে অভিভাবিকা সরস্বতী বর্মণ সহ ২ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তা সত্ত্বেও তাঁরা অনশন চালিয়ে যান। অবশেষে প্রবল জনমতের চাপে এস ডি ও' সদরের মধ্যস্থতায় ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক আন্দোলনরত ছাত্র-অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে লিখিতভাবে দাবিগুলি মেনে নেন। ঠিক হয়, যাদের ১৬০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে, তাদের টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি ফি গ্রামাঞ্চলে ৬৩ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৭৫ টাকা। এই পরিমাণ ফি দেওয়াই যেখানে ব্যাপক ছাত্র-অভিভাবকদের পক্ষে কষ্টকর, সেখানে কোনো কোনো স্কুল অত্যধিক হারে ভর্তি ফি নিচ্ছে। আন্দোলনের উদ্যোক্তা ডি এস ও জেলা কমিটির চাপে ডি-আই, সমস্ত স্কুলে এই মর্মে চিঠি পাঠিয়েছেন যে, সরকার নির্ধারিত ফি-এর বেশি যেন না নেওয়া হয়। পেস্টারঝাড় স্কুলের ছাত্র-অভিভাবক কমিটি ও ডি-এস-ও'র আন্দোলনের ফলে সর্বত্র নূতন উদ্যমে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সদ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতা সি পি এমের জিলা পরিষদ সদস্য ও নেতার ঔদ্ধত্য গণআন্দোলনের সামনে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে — এতে জনমনে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিল ২০০৩

সাতের পাতার পর

স্বার্থবাদীরা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নতুন করে 'পারস্পরিক ভর্তুকি' বলে চালাতে শুরু করে। তারা এটা করেছিল এই কারণেই যে, যেহেতু জনসাধারণ এত শত খবর রাখে না, তাই এইভাবে বললে জনসাধারণকে সহজেই তারা ঠকাতে পারবে। তখন থেকে সি পি এমও এই কোরাসে যোগ দিয়ে 'পারস্পরিক ভর্তুকি' কথাটা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে, এবং বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের সুরে সুর মিলিয়ে তারাও বলছে — সরকার টাকা পাবে কোথায়। বিশাল মন্ত্রীসভা গঠনে, বিলাসব্যসনে, সরকারি টাকায় ক্যাডার পোষণে তাদের টাকার অভাব হয় না। তাদের টাকার যত অভাব জনসাধারণের দুঃখমোচনে, তাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য প্রদানে। এই কথার দ্বারা তারা তাদের অসহায়তা দেখাচ্ছে তা নয়, নাচার ভাব দেখিয়ে তারা আসলে ভর্তুকি তুলে দেওয়াকেই যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছে। এইভাবে সি পি এম শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতির দামই শুধু বাড়াচ্ছে না, এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মানসিকতাকে নষ্ট করে দিয়ে বিশ্বায়ন ও বেসরকারীকরণের পথকে বাধাহীন করার চেষ্টা করছে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net